



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 777 - 784

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সুরমা-বরাক উপত্যকায় মনসা পূজার ঐতিহ্য ও নৌকা পূজা : একটি পর্যালোচনা

ড. সূর্যসেন দেব

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাধামাধব কলেজ, শিলচর, কাছাড়, আসাম

Email ID: surjuasendeb18@gmail.com

 0009-0004-7858-9385

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Barak Valley,
Folk Tradition,
Manasamangal
Kabya, Manasa
Puja, Nouka
Puja, Ojhadance.

Abstract

The Barak Valley, situated in the southernmost part of Assam, is a densely populated Bengali-speaking region and an integral part of the larger Bengali cultural sphere. Enclosed by rivers and hills, this riverine landscape has nurtured a rich folk tradition, among which the worship of Goddess Manasa occupies a prominent place. Manasa Puja is widely observed in Bengali households, particularly during the month of Shravan through the recitation of Padmapurana (Manasa mangal), culminating on Shravan Sankranti. Apart from these domestic rituals, Manasa Puja is also performed on various Panchami tithis and Mondays throughout the year.

A distinctive and elaborate form of Manasa worship, locally known as Nouka Puja (Boat Worship), is observed on the Shukla Panchami of the month of Magh or Phalgun. This ritual, lasting for three, five, or eight days, constitutes a significant folk-religious festival of the Barak Valley. Ojhadance forms an inseparable component of Nouka Puja, and in several places the occasion is marked by the organization of folk fairs.

Nouka Puja represents a confluence of diverse elements of folk culture, including folk dance, folk drama, folk festivals, myths, and traditional beliefs. Thus, it transcends the boundaries of mere religious worship and emerges as an important expression of the region's vibrant folk heritage. Even in contemporary times, Nouka Puja continues to be celebrated with considerable grandeur across various parts of the Barak Valley. Based on data collected through fieldwork, this research paper attempts to present a comprehensive overview of Nouka Puja as a valuable and living tradition of the Barak Valley's folk culture.

Discussion

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আসাম রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বাঙালি প্রধান অঞ্চল বরাক উপত্যকা। কাছাড় করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি এই তিনটি জেলা নিয়েই বরাক উপত্যকা। 'বরাক' নদীর নামানুসারে এই উপত্যকার নাম হয়েছে বরাক।

বরাক নদীর প্রাচীন নাম ‘বরবক্র’। বরাক উপত্যকার পূর্বে মণিপুর রাজ্য, পশ্চিমে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলা, উত্তরে আসামের উত্তর-কাছাড় পার্বত্য অঞ্চল এবং দক্ষিণে লুসাই পাহাড় ও মিজোরাম রাজ্য। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক রাজনৈতিক বিভিন্ন দিক থেকে এই অঞ্চলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠীর সমন্বয়ের পাশাপাশি নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন এই অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে। এ উপত্যকায় মণিপুরি, মার, ডিমাছা, নাগা, খাসিয়া, চা জনগোষ্ঠী ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ভাষাসম্প্রদায়ের লোকের বসবাস রয়েছে। তবে এ উপত্যকার আশি শতাংশ লোক বাংলাভাষী অর্থাৎ বাঙালি। তাই এই বরাকভূমি বাংলার তৃতীয় ভূবন হিসেবে খ্যাত। এই উপত্যকার হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলা এক সময় ছিল শ্রীহট্ট (বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট) এর অংশ। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে এই অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক চেহারা ও ভৌগোলিক পরিচয় পরিবর্তিত হয়েছে। একসময় সিলেট ছিল বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত। ১৮৭৪ সালে কাছাড় জেলাকে আসাম রাজ্যের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় সিলেটের রাতাবাড়ি, পাথারকান্দি, বদরপুর থানা ও করিমগঞ্জ থানার কিছু অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর বাকী অংশ চলে যায় পূর্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে। রাজনৈতিক কারণে এই অঞ্চল দুই দেশে বিভাজিত হলেও সুরমা-বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এবং বর্তমান সময়েও এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একই ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

সুরমা-বরাক উপত্যকায় বাঙালি হিন্দু সমাজে লৌকিক-পৌরাণিক দেবী মনসার বিশেষ জনপ্রিয়তা রয়েছে। এতদঞ্চলে মনসা পূজার ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রীহট্টের কৃতি সন্তান বিপিনচন্দ্র পালের একটি মন্তব্য খুবই প্রচলিত। তিনি বলেছিলেন, সুরমা-বরাক উপত্যকায় মনসা পূজার ব্যাপকতা দুর্গাপূজার চাইতেও বেশি। মনসাপূজা সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য যে শতভাগ সত্য ও যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। বরাক উপত্যকায় প্রায় সারা বছরই বিভিন্ন তিথি যেমন - আষাঢ় মাসের কৃষ্ণ পঞ্চমী, আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি, শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী ও কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিতে এবং শ্রাবণী সংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতদঞ্চলে দেবী মনসা বিভিন্ন রকমের প্রতিমা বা মূর্তিতে পূজিতা হন। যেমন - ১. চাতল ঘট, ২. বিশ ঘট বা বিশ নাগ ৩. অষ্ট নাগ ৪, নব নাগ ৫. পাট বিষহরি ৬. জয়া বিজয়া বিষহরি ৭. ডরাই বিষহরি এবং ৮. নৌকা বিষহরি। নৃত্য-গীত-বাদ্য এতদঞ্চলের মনসা পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় কাণাহরি দত্ত থেকে শুরু করে অনেক কবি চাঁদসদাগর ও মনসার কাহিনি রচনা করে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। শ্রীহট্ট অঞ্চলেও মনসামঙ্গল কাব্যের কয়েকজন প্রতিভাবান কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন - রামচন্দ্র চৌধুরী, রাধামাধব দত্ত। এছাড়াও কবি সংকলক চৈতন্যচরণ পাল, কবি ষষ্ঠীবর দত্ত, দ্বিজবংশীদাস, নারায়ণ দেব, রাধানাথ রায়চৌধুরী এবং বাইশকবি পদ্মাপুরাণ এতদঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়।

সুরমা-বরাক উপত্যকায় প্রধানত তিনধরনের মনসা পূজার প্রচলন লক্ষ করা যায়। প্রথমত, পঞ্চমী তিথি বা শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত শ্রাবণী পূজা, দ্বিতীয়ত, ডরাই বিষহরি পূজা আর তৃতীয়ত নৌকা পূজা। প্রত্যেক ধরনের পূজারই নৈজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শ্রাবণী পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ‘বইপড়া’ বা ‘পদ্মাপুরাণগান’ গান। শ্রাবণ মাসের প্রথমদিন থেকে বইপড়া অর্থাৎ মনসামঙ্গল কাব্য পাঠ করা শুরু হয়। আর শেষ হয় শ্রাবণী সংক্রান্তিতে দেবী মনসার পূজার সাথে। প্রধানত মহিলারাই পদ্মাপুরাণ গানের মূল উদ্যোক্তা। তবে পুরুষেরাও পদ্মাপুরাণ গানে অংশগ্রহণ করেন। হাততালি দিয়ে তাল রক্ষা করে গান করা হয়। আবার কাঁসর, ঘন্টা, পাখাজ, ঢোলক, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগেও গান করা হয়। পদ্মাপুরাণ গানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হল পাখাজ। মহিলারা এক জায়গায় সমবেত হয়ে পদ্মাপুরাণ গান করেন। একজন থাকেন দলপ্রধান। অর্থাৎ মূল গায়ক বা পাঠক। অন্যরা দোহার দেন। সময়ে সময়ে দলের মধ্য থেকেই মূল গায়ক বা পাঠকের পরিবর্তন হয়। এই গানকে পদ্মাপুরাণ গানও বলা হয়। পদ্মাপুরাণ গানে চৈতন্যচরণ পালের পদ্মাপুরাণ পুথিই অধিক জনপ্রিয়। এছাড়া, দ্বিজবংশীদাস এবং বাইশকবি পদ্মাপুরাণও গান করা হয়।

দেবী মনসার আরেকটি রূপ ‘ডরাই বিষহরি’। এই পূজা ‘ডরাই বিষহরি পূজা’ নামে প্রচলিত। যদিও এতদঞ্চলে ‘ডরাই বিষহরি’ পূজা এখন প্রায় লুপ্ত। কারো মানস থাকলে এই পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে তা একান্তভাবেই পরিবার কেন্দ্রিক। এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় ঘরের বাইরে নির্জন স্থানে। এক সময় সুরমা-বরাক উপত্যকায় ডরাই বিষহরি

পূজার প্রচলন ছিল। মূলত নিম্নবর্গীয় সমাজেই এই দেবীর পূজার প্রচলন ছিল। বিশেষ করে মৎসজীবী সমাজে। দেবী মনসার বাহন হাঁস। কিন্তু ডরাই বিষহরি দেবীর বাহন কূর্ম। গ্রামে নির্জন স্থানে ডরাই বিষহরি পূজার আয়োজন করা হয়। সন্তান কামনায় বা সন্তানের মঙ্গল কামনায় দেবীর পূজো দেওয়া হয়। এই পূজার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল গুরমা বা গুরমীর ভূমিকা। একমাত্র গুরমা বা গুরমীরাই এই পূজার অধিকারী। তবে বর্তমানে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। এই পূজায় মহিলা এবং ছোট ছেলে-মেয়েরা অংশগ্রহণ করতে পারে না। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকে মাত্র একজন সদস্য এ পূজায় অংশগ্রহণ করেন। কারণ, এ পূজায় চরম পর্যায়ের অশ্লীলতা থাকে। ‘ডরাই বিষহরি’ পূজায় ওঝানৃত্য-গীতের আয়োজন করা হয়।

সুরমা-বরাক উপত্যকায় দেবী মনসার পূজার সর্ববৃহৎ আয়োজন হল নৌকা পূজা বা নৌকা বিষহরি পূজা। এই পূজার আয়োজন দুর্গা পূজার আয়োজন থেকেও বিশাল। এই পূজা আট দিন বা পাঁচ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় বর্তমানকালে তিনদিনব্যাপী এই পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। নৌকা পূজা অনুষ্ঠিত হয় শ্রীপঞ্চমী অর্থাৎ সরস্বতী পূজার দিন। ওই সময়ে মাঠের ধান কাটাও শেষ হয়ে যায়। খোলা মাঠে এই পূজার আয়োজন করা হয়। কারন এই পূজার আয়োজন বিশাল। নৌকা পূজা উপলক্ষে লোকমেলারও আয়োজন করা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ এসে পূজায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে ওঝানৃত্য-গীত। এই পূজাকে তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজাও বলা হয়। যদিও প্রধান দেবী হলেন দেবী মনসা। সাথে থাকেন শতাধিক দেব-দেবীর মূর্তি। কথিত আছে যে, দেবসভায় লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেবার সময় যে দেব-দেবীরা উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলকেই দেবী মনসার সাথে পূজা দেওয়া হয়। বিশালাকার নৌকার উপরে সাত সিঁড়ি বা পাঁচ সিঁড়িতে খোপ খোপ করে দেব-দেবীর মূর্তি সাজানো হয়। প্রথম সিঁড়িতে থাকে তিনটি বড় খোপ। মধ্য খোপে থাকেন দেবী রং বিষহরি। সাথে থাকেন নেতা, সোমেশ্বরী, সুগন্ধা, জটাধর, ষষ্ঠীধর। দেবীর ডানদিকে থাকেন জয়া বিজয়া সহ মকর বাহিনী গঙ্গা। সাথে কাত্যায়নী, শ্রীধর, গদাধর। বাদিকে থাকেন দশভূজা দুর্গার পাঁচমূর্তি কাঠাম। সাথে ভুবনেশ্বরী, বিদ্যাধর। দ্বিতীয় সিঁড়িতে থাকে নবগ্রহ অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, রাহু, কেতু ইত্যাদি। তৃতীয় সিঁড়িতে থাকেন বিষুংর দশাবতারের মূর্তি। চতুর্থ সিঁড়ির মাঝখানে মাধ্যখানে থাকেন ধর্মরাজ। আর তাঁর দুই পাশে চিত্রগুপ্ত, আস্তিকমুনি, জরৎকারুমুনি, নারদ, কুবের, নৈঋত, বায়ু, অগ্নি প্রমুখ। পঞ্চম সিঁড়ির মাঝখানে থাকেন মহাদেব। আর মহাদেবের দুইপাশে থাকেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দক্ষরাজ, উমানন্দ ভৈরব, হরগৌরী, ভৃঙ্গী, হরগৌরী, পঞ্চগনন প্রমুখ। ষষ্ঠ সিঁড়িতে থাকেন অষ্টসখী সহ রাধাকৃষ্ণ। সপ্তম সিঁড়িতে থাকেন ধ্যানমগ্ন মহাদেবের মূর্তি। নৌকার দুই পাশে থাকে বৈঠা হাতে নৌকা চালানোর ভঙ্গিমায় দুলাই মাঝি আর কুলাই মাঝি। নৌকার সামনে একটি সিঁড়ির মতো তৈরি করা হয়। ওই সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে বসে থাকেন চাঁদসদাগরের ছয় পুত্র। নৌকার সামনে হাত জোড় করে থাকেন গজপৃষ্ঠে চাঁদসদাগর, ঘোড়াপৃষ্ঠে লখিন্দর, বেহুলা, সনকা, ধন্বন্তরী ওঝা প্রমুখ। তবে পূজার স্থান বিশেষে মূর্তি প্রতিস্থাপনে এর তারতম্যও অবশ্য লক্ষ করা যায়। অনেক জায়গায় দশমহাবিদ্যা অর্থাৎ কালীর দশটি রূপও তৈরি করা হয়। অনেক সময় সাত সিঁড়ির বদলে পাঁচ সিঁড়ি তৈরি করা হয়। ফলে মূর্তির সংখ্যা স্বাভাবিক ভাবে কমে আসে।

নৌকা পূজা নাম হলেও আসলে নৌকার পূজা নয়। নৌকায় অধিষ্ঠিত দেবী মনসার পূজা। এই পূজাকে চাঁদসদাগরের পূজা বলা হয়। নৌকা পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় মনসামঙ্গল কাব্যে। মনসামঙ্গল আখ্যান কাব্যের কাহিনীতে দেখা যায় যে, বেহুলা নিজের স্বামী লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য দেবসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিশেষ নৃত্য-গীতে উপস্থিত মহাদেবসহ অন্যান্য দেব-দেবীদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহাদেবের আদেশে দেবী পদ্মা অর্থাৎ মনসা লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে রাজী হয়েছিলেন। তবে দেবীর শর্ত ছিল যে, চাঁদসদাগর যদি দেবীর পূজা দিতে রাজী হন তবেই তিনি লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন। বেহুলা দেবী বিষহরির এই শর্তে রাজী হয়েছিলেন। উপস্থিত সকল দেব-দেবীকে সাক্ষী রেখে বেহুলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তার শ্বশুর অর্থাৎ চাঁদসদাগরকে দিয়ে দেবী মনসার পূজা করাবেন। কবি দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে পাই -

“বেহুলা বলেন সত্য আমি করি ভর।

অবশ্য পূজিবে তোমা শ্বশুর সদাগর।।
যদি নাহি পূজে তোমা কনক কমলে।
বাহুড়ি আসিব এথা নারায়ণ দেবে বলে।।”^১

বেহুলার প্রতিশ্রুতিতে উপস্থিত সকল দেব-দেবীরা বেহুলার পক্ষ নেন এবং মনসার উদ্দেশ্যে বলেন, -

“দেবগণ বলিলেন পদ্মার গোচর।
সত্য কৈল বেহুলা জীয়ালে লখিন্দর।।
তোমা লইয়া চলি যাব চম্পক নগর।
এক লক্ষ বলি দিয়া পূজিবে চন্দ্রধর।।
দেবগণ বচনে পদ্মা কৈল অঙ্গীকার।
জীয়াইতে লখিন্দরে করিল স্বীকার।।”^২

দেবী মনসা লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি চাঁদসদাগরের অন্য ছয় পুত্রসহ সমুদ্রে ডোবানো চৌদ্দ ডিঙাও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পুত্র সন্তান, ধন-সম্পদ সমস্ত কিছু ফিরে পাবার পরও চাঁদসদাগর দেবী মনসার পূজা দিতে রাজী হননি। তবে পুত্রবধূ বেহুলা, স্ত্রী সনকা ও প্রজাগণের কাতর অনুরোধে চাঁদসদাগর শেষপর্যন্ত মনসার পূজা দিতে রাজী হন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে আমরা দেখতে পাই যে, বণিক চাঁদসদাগরের পূজা পাবার আশায় দেবী সর্পগণকে ‘বহিত্র’ বহন করে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ দেন। দেবীর আদেশে সর্পগণ বহিত্র বহন করে নিয়ে যায় -

“যদি সে জগাতি দিলেন আরতি
চলে চারিশত অহি।
বহিত্র লইয়া পৃষ্ঠে বসাইয়া
চাঁদের বাটীতে বহি।।
চাঁদ ভাগ্যবান ডিঙ্গা চৌদ্দখান
নাগেতে বহিয়া দিল।
উল্লসিত হৈয়া পুত্রবধূ লৈয়া
নিজ ঘরে বসাইল।।
জ্বালি ধূপ ধুনা বিয়াল্লিশ বাজনা
বহিত্র অর্চনা করে।
মঙ্গল শঙ্খধ্বনি ঘনঘন শুনি
দেবী সুপ্রসন্ন তারে।।”^৩

বিশেষজ্ঞদের মতে এই ‘বহিত্র অর্চনা’ই নৌকা পূজা। চাঁদসদাগর নৃত্য-গীতসহ সাতদিন ব্যাপী দেবী মনসার পূজার বিপুল আয়োজন করেছিলেন। শ্রীহট্টের কবি রামচন্দ্র চৌধুরীর শ্রীশ্রী পদ্মাপুরাণ কাব্যে এর বর্ণনায় পাই -

“শ্রীধরের স্থানে বলে রাজা চন্দ্রধরে।
সপ্তাহের সঙ্কল্প করহ পূজিবারে।।
প্রতিদিন লক্ষ বলি লক্ষ যে আহুতি।
পূজা পাইয়া হউকা তুষ্ট পদ্মাবতী।।
চান্দের বাক্যেতে পদ্মা হরষিত হৈয়া।
ওঝা বাদক দোহার দিলেন সৃজিয়া।।
দশ জন লোক তারা আসিল সাজিয়া।
চর মৃদঙ্গ কর্তাল স্ব স্ব যন্ত্র লৈয়া।।”^৪

দেবী মনসার পূজায় যে নৃত্য-গীত একটি আবশ্যিক অঙ্গ। মনসামঙ্গল কাব্য বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যেরও সম্পদ। মনসামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে নৃত্য-গীত ও পালাগান বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্নভাবে প্রচলিত। দেবীর পূজা উপলক্ষে নানা আঙ্গিকে এই নৃত্য-গীত ও পালা গান পরিবেশিত হয়। যেমন - বিষহরা বা বিষহরি গান, পদ্মাপুরাণের গান, মনসাভাসান, মনসাযাত্রা, ইত্যাদি। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল-সহ সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত পালাগানের নাম ‘পদ্মার নাচন’ বা ‘বিষহরার নাচ’। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে এই নৃত্য-গীত অনুষ্ঠান ‘মনসাকীর্তন’ নামে প্রচলিত। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এর নাম ‘ঝাপান’। বরিশাল অঞ্চলে মনসামঙ্গল কাব্যের পরিবেশ্য কলার নাম ‘রয়ানী’। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মনসাপূজা উপলক্ষে পরিবেশিত নৃত্য-গীত ওজাপালি ও দেওধনি। মনসা পূজার সময় যে নৃত্য-গীত অনুষ্ঠিত হয় সুরমা-বরাক উপত্যকায় তার নাম ওঝানৃত্য। নৌকা পূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ওঝানৃত্য। ওঝানৃত্য শিল্পীদের মধ্যে একটি রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, কোথাও নৌকা পূজা হচ্ছে শুনতে পেলে তারা স্বেচ্ছায় গিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং নৃত্য-গীত পরিবেশন করেন। পূজা যতদিন অনুষ্ঠিত হয় ততদিন ওঝানৃত্য-গীতও অনুষ্ঠিত হয়। আর ওই অঞ্চলের সকল ওঝানৃত্য শিল্পীরা বিনা নিমন্ত্রণে ও বিনা পারিশ্রমিকে সেখানে উপস্থিত হয়ে নৃত্য-গীত পরিবেশন করেন। যদিও বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা কারণে এই নিয়ম আর আগের মতো নেই। তবে ওঝানৃত্য ছাড়া নৌকা পূজা অসম্পূর্ণ। আজও এই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

নৃত্য-গীত-অভিনয় সহযোগে সম্পূর্ণ মনসামঙ্গল কাব্য ভক্ত-দর্শক শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার নাম ‘ওঝানৃত্য’। শ্রীহট্টের মনসামঙ্গলের কবি সংকলক রামচন্দ্র চৌধুরী সংকলিত ‘শ্রীশ্রী পদ্মাপুরাণ’-এ ওঝানৃত্যের দলগঠনের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে -

‘চান্দের বাক্যেতে পদ্মা হরষিত হৈয়া।
ওঝাবাদক দোহার দিলেন সৃজিয়া।।
দশজন লোক তারা আনিল সাজিয়া।
চর মৃদঙ্গ কর্তাল স্ব স্ব যন্ত্র লৈয়া।।
পদ্মার গায়ক বলি প্রচার করিল।
দেবীকে প্রণাম করি গান আরম্ভিল।।
পদ্মপুরাণের কথা দেবখণ্ডে যত।
চান্দে পদ্মার বিবাদ যে সব বৃত্তান্ত।।
সগুহে ঐসব ওঝা করিলেক গান।
পূজার আয়োজন প্রতিদিন সমান।।’^৫

দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য দেবী স্বয়ং ওঝানৃত্যের দল গঠন করে দিয়েছেন। কাব্যে ওঝানৃত্যের দল গঠনের উল্লেখ্য, বৃহত্তর শ্রীহট্ট অঞ্চলে ওঝানৃত্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকেই প্রমাণ করে। মনসা পূজার সময়ই ওঝানৃত্য পরিবেশন করা হয়। তবে আজকাল এর ব্যতিক্রমও অবশ্য লক্ষ করা যায়। একসময় ওঝানৃত্যকে ‘গুরমা’ বা ‘গুরমীনাচ’ বলে অবহেলা করা হত। কারণ, একসময় তারাই এই নৃত্য-গীত পরিবেশন করতেন। তবে এ ধারণা এখন আর নেই। কেননা ওঝানৃত্য আজ আর শুধুমাত্র গুরমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্বাভাবিক পুরুষ-নারীরাও এখন ওঝানৃত্যশিল্পী। ‘ওঝা’ শব্দের আভিধানিক অর্থ সর্পবিষ চিকিৎসক। অর্থাৎ যারা সাপের কামড়ের চিকিৎসা করেন। বা ভূত ছাড়ায়। সংস্কৃত ‘উপাধ্যায়’ শব্দ থেকে প্রাকৃত ‘ওজঝায়’ হয়ে বাংলায় ‘ওঝা’ শব্দটি এসেছে। অসমীয়াতে হয়েছে ‘ওজা’। ওঝা শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে পণ্ডিত। আবার ব্রাহ্মণের উপাধিও ওঝা। তবে ওঝানৃত্যগীত যারা পরিবেশন করেন তারা ব্রাহ্মণ নন। ওঝানৃত্য শিল্পী হিসেবে আমরা যাদের পাই এদের বেশির ভাগই নাথ, দাস, মালাকার, গুরুবৈদ্য, নমঃসূত্র, পাল ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের। তাঁরা সর্পবিষের চিকিৎসক নন। শুধুমাত্র শিল্পী। কেউ কেউ অবশ্য ঝাড়ফোক করে থাকেন। ওঝানৃত্যগীতকে পেশা হিসেবে নিলেও কৃষিকাজ বা অন্যান্য শ্রমই তাদের জীবিকার্জনের প্রধান মাধ্যম। ফলে একথা স্পষ্ট যে, সর্পবিষ চিকিৎসক ওঝা আর শিল্পী ওঝার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

ওঝানুত্বে একজন প্রধান শিল্পী বা দলপতি থাকেন। তিনি একই সঙ্গে গায়ক-নর্তক এবং অভিনেতা। তাঁর পোষাক থাকে একটু ভিন্ন ধরনের। যেমন- ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাত লম্বা কুচিযুক্ত সাদা রঙের ঘাঘরা। পাড় থাকে লাল বা হলুদ রঙের। সাদা রঙের ফুলহাতার শার্ট বা পাঞ্জাবী। মাথায় পাগড়ি। পায়ে নুপুর এবং হাতে কালো রঙের চামর। কপালে তিলক কানে কুন্তল। প্রচলিত বিশ্বাস উষা এবং অনিরুদ্ধ এই ধরনের পোষাক পরিধান করে নৃত্য করতেন। আর কালো চামরে দেবী মনসার অধিষ্ঠান বলে ওঝানুত্বেশিল্পীরা বিশ্বাস করেন। উল্লেখ্য, চামর তৈরি হয় চমরী গাভীর লেজ দিয়ে। যা পাওয়া যায় তিব্বত দেশে। উল্লেখ্য, করণ্ডী (ঝাঁপি) সাজিয়ে শিব চমরী (তিব্বতী গাভী) গাভীতে করেই মনসাকে কৈলাশে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই ওঝা নৃত্যশিল্পীদের কাছে চামর খুবই পবিত্র। এবং এর মধ্যে অলৌকিক শক্তি রয়েছে বলেও তারা বিশ্বাস করেন। ওঝানুত্বেশিল্পীর সঙ্গে আসরে থাকেন অন্যান্য শিল্পীরা। শিল্পীর দুদিকে দুজন পাখাজ বাদক থাকেন। ডানদিকে ‘ডাইনা’ আর বাদিকে ‘বায়’। এছাড়া ছোট ও বড় করতাল মন্দিরা এবং কাঁসর ইত্যাদি নিয়ে অন্যান্য শিল্পীরা থাকেন। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে গানের সঙ্গেও তারা দোহার দিয়ে থাকেন। মঙ্গলকাব্য যেমন সব দেব-দেবীর বন্দনা দিয়ে শুরু হয় ওঝানুত্বে ঠিক একইভাবেই বন্দনা দিয়েই শুরু হয়। সব দেব-দেবীর বন্দনার সঙ্গে দিকবন্দনা গুরুবন্দনা আসর বন্দনা দিয়ে শুরু ওঝানুত্বে। মনসামঙ্গল কাব্যে যেরকম ধ্রুপদী রাগ-রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায় তার ব্যবহার অবশ্য লক্ষ করা যায় না। বেশীর ভাগ লোকসঙ্গীতের সুরেই গান করা হয়। দর্শক-শ্রোতাদের এক্ষেপেমী দূর করার জন্য কখনও কখনও আধুনিক গানের সুরও ব্যবহার করতে দেখা যায় আজকাল। অনেক সময় বাউল-ভাটিয়ালী, ধামাইল গানও পরিবেশন করা হয়। মাঝে মাঝে একটানা পয়ার ছন্দে গান করে যান। তবে কাহিনির নাটকীয় মুহূর্তগুলিকে অতি গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়। শিল্পী এখানে নিজেকে উজাড় করে দেন। আঙ্গিকাভিনয় বাচিকাভিনয় আহাৰ্য্যভিনয় ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায় ওঝানুত্বে। এছাড়াও চারি, দৃষ্টিভেদ, পাদভেদ, শিরোভেদ ইত্যাদিরও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় ওঝানুত্বে। হংসচলন, সর্পচলন, ময়ূরচলন, খঞ্জনগমন ইত্যাদি ওঝানুত্বে অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ওঝানুত্বে সম্পূর্ণভাবেই গুরুপরম্পরা ধারার নৃত্য। সাত-আট বা নয়-দশ মোটামুটি এরকম বয়সের মধ্যেই শিক্ষার্থীকে গুরুর আশ্রয়ে আসতে হয়। তবে গুরু সকলকেই শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন না। বিশেষ কিছু গুণাবলীর পরীক্ষা করেই শিষ্য বাছাই করা হয়। ওঝানুত্বে শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সকল গুণাবলী অতি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুমধুর কণ্ঠস্বর, স্মৃতিশক্তি, সুন্দর শারীরিক গঠন ইত্যাদি। এ সমস্ত গুণাবলীর পরীক্ষা করার পর গুরু শিষ্যকে গ্রহণ করেন। এরপর গুরু বরণ করে শুরু হয় শিষ্যের ওঝানুত্বে তালিম। শিষ্যকে গুরুর আশ্রয়ে থেকে কঠোর সংযম পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে ওঝানুত্বে তালিম নিতে হয়। শিষ্যের নৃত্যশিক্ষায় গুরু যেদিন সন্তুষ্ট হন সেদিন শিষ্যের হাতে চামর তুলে দেন। গুরুর কাছ থেকে এই চামর পাওয়া মানে ওঝা নৃত্য পরিবেশন করার অধিকার লাভ করা। তবে বর্তমান এই সমাজ ব্যবস্থায় এই গুরু পরম্পরার ঐতিহ্য প্রায় নেই। নানা কারণে এই নৃত্যকলার প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহও নেই। তবে গুরু পরম্পরা ধারা যে একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে তা নয়। আজও গুরু পরম্পরা ধারার মাধ্যমেই ওঝানুত্বে জীবিত রয়েছে। আর এই পরম্পরা মেনেই এই নৃত্যকলা আয়ত্ব করতে হয়। ওঝানুত্বে প্রধান উপাদান কালো রঙের চামর। ওঝা এই চামর হাতে নিয়েই নৃত্য পরিবেশন করেন। সর্পদংশনের চিকিৎসায়ও অবশ্য চামরের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চামরের মতো ওঝানুত্বে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো কাঁচা মাটির সর। মনসামঙ্গল কাব্যে দেবসভায় বেহলার যে পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায় যে বেহলা কাঁচা মাটির সরার উপর দাঁড়িয়ে সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করেছেন। ওঝানুত্বেও ঠিক একইরকম ভাবে মাটির সরার উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। শিল্পী এমনভাবে নৃত্য করবেন যাতে মাটির সর না ভাঙে। মাটির সরার মতো বাতাসার উপর দাঁড়িয়ে নৃত্যকলা প্রদর্শন করা হয়। যদিও বর্তমানে এই শিল্পকলা প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। ওঝা নৃত্বে প্রধান বাদ্যযন্ত্র পাখাজ। এছাড়া থাকে বড় করতাল, ছোট করতাল, মন্দিরা, কাঁসর ইত্যাদি। শিল্পীর পায়ে থাকে নুপুর।

নিয়মিত না হলেও বরাক উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে এখনও মহাসমারোহে নৌকা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্থান হল করিমগঞ্জ জেলার দুর্লভছড়া, নিলামবাজার। কাছাড় জেলার ফুলেরতল দিলখুশ বস্তি, আমড়াঘাট, চাতলা ইত্যাদি। নৌকা পূজা প্রধানত বারোয়ারি পূজা হলেও এবছর আমড়াঘাট অঞ্চল ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় নৌকা

পূজা। পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই পূজায় ছিল পাঁচ সিঁড়ির মূর্তি। প্রতিদিনই পরিবেশিত হয় ওঝানৃত্য-গীত। এই পূজার আয়োজক ছিলেন অসিত কুমার রায়। তিনি তাদের এই পূজার ইতিহাস সম্পর্কে জানান যে, তাদের পরিবারে এই পূজার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। সাত শতাব্দী পূর্বে পৃথিবীর ব্রহ্মচারী হতে তাদের বংশের সূচনা। পরবর্তীকালে তাদের বংশধরদের মধ্যে রায়মণি ও চুড়াণি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাল্যকাল থেকেই দুই ভাই দেবী মনসার পরম ভক্ত ছিলেন এবং মনসার কীর্তন গানেও পারদর্শী ছিলেন। আনুমানিক ১৬৭০ থেকে ১৬৮১ ইংরেজির মধ্যে এক পঞ্চমী তিথিতে দেবী বিষহরি স্বয়ং এসে তাদের একজোড়া চামর, সোনার পাখাজ, পদ্মাপুরাণ এবং দৈববিদ্যা প্রদান করেন। কোথাও বিষহরি পূজা হলে সেই পাখাজ আপনা থেকেই বেজে উঠত। তখন দুই ভাই সেখানে গিয়ে মনসার কীর্তন গান করতেন। একবার আনুমানিক ১৬৮১ সালে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলার জৈনতাপুরে মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের রাজবাড়িতে নৌকা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাজার আমন্ত্রণেই দুই ভাই সেখানে গান গাওয়ার জন্য উপস্থিত হন। সেখানে রাজবাড়ির দাড়ায়েন দুই ভাইকে চিনতে না পেয়ে গেটের বাইরে তাদের অপেক্ষা করতে বলেন। দাড়ায়েন মহারাজের অনুমতির জন্য ভেতরে গেলে তার ফিরে আসতে অনেক দেরী হয়। অনেক সময় অপেক্ষা করে দুই ভাই রাজবাড়ির পাশের জমির কচুবন পরিষ্কার করে গান গাইতে শুরু করে দেন। তাদের মনসাকীর্তন শুনে দেবী বিষহরী মুগ্ধ হন। ফলে দেবীর কৃপায় রাজবাড়ির নৌকা পূজার নৌকা আপনা থেকেই উল্টো দিকে অর্থাৎ দুই ভাইয়ের দিকে ঘুরে যায়। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সমস্ত ঘটনা জানতে পেয়ে দুই ভাইয়ের কাছে ছুটে আসেন এবং পায়ে ধরে তাদের রাজবাড়ির ভিতরে নিয়ে যান। দুই ভাই রাজ বাড়ির ভিতরে গিয়ে গান পরিবেশন করেন। ফলে নৌকা আবার পূর্বাবস্থায় স্থিত হয়। মহারাজা তখন তাদেরকে রায় উপাধি এবং এক হাজার দুইশত বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। তাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে আরও অনেকেই ওঝানৃত্য-গীতে পারদর্শী ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন গোপী রায়, উল্লাস রায়, গোলাব রায়, গোলক রায়, বৈকুণ্ঠ রায়, কান্তি রায়, যোগেন্দ্র রায়, ভগবতী প্রসন্ন রায়, কালী প্রসন্ন রায় ও কৃষ্ণ রায় প্রমুখ। পরবর্তীকালে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লে এই পূজা ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ উদ্যোগ নিয়ে এই পূজার আয়োজন করে থাকেন। কারণ এই পূজা প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ, সময় সাপেক্ষ এবং এই পূজার আয়োজনকে সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে প্রচুর লোকজনেরও প্রয়োজন হয়। ফলে নিয়মিত এই পূজার আয়োজন করা সহজ নয়।

সমগ্র বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, আসামে মনসা পূজার যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে তারই ধারা আমরা লক্ষ্য করি সুরমা-বরাক উপত্যকায়। নৌকা পূজা সম্ভবত সুরমা-বরাক উপত্যকার নিজস্ব সম্পদ। আর কোথাও এমন বিশাল আকারে এত সাড়স্বরে মনসা পূজার আয়োজন হয় কিনা সন্দেহ আছে। সংখ্যায় কম হলেও প্রতি বছর কোনো না কোনো জায়গায় নৌকা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আর এই উপলক্ষে লোকমেলা, ওঝার নৃত্য-গীতের আসর বসে। যেখানে প্রচুর ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়। ফলে বলা যায় নৌকা পূজা বরাক উপত্যকার লোকঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদ। যা বিশ্বায়নের যুগে এসেও তার ঐতিহ্য ও পরম্পরা নিয়ে জীবিত রয়েছে।

Reference:

১. গুপ্ত, শ্রীমদন গোপাল ও হালদার, শ্রীধনপতি, সম্পাদক, দ্বিজ বংশীদাস কৃত শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ, কলকাতা, জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রেস, পৃ. ২৩৩
২. তদেব
৩. ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী, সম্পাদক, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল, নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১০, পৃ. ১১০
৪. চৌধুরী, রামচন্দ্র, সংকলক, শ্রীশ্রী পদ্মপুরাণ, শিলচর, নীলোৎপল চৌধুরী, ২০০৭, পৃ. ৩৩৮
৫. তদেব

Bibliography:

চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সম্পাদক, শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা, শিলং, রবীন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৬

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলকাতা, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৮ম সংস্করণ
পুনর্মুদ্রণ, ২০০০
ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী, সম্পাদক, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল, নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ
২০১০
চৌধুরী, রামচন্দ্র, সংকলক, শ্রীশ্রী পদ্মপুরাণ, শিলচর, নীলোৎপল চৌধুরী, ২০০৭
গুপ্ত, শ্রীমদন গোপাল ও হালদার, শ্রীধনপতি, সম্পাদক, দ্বিজ বংশীদাস কৃত শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ, কলকাতা, জেনারেল
লাইব্রেরী এ্যান্ড প্রেস।
দেব, সূর্যসেন, গৌড়ীয় নৃত্যের গুরু পরম্পরা ধারার ওঝানৃত্য, গুয়াহাটি, ভিকি পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ, ২০১২

তথ্যদাতা : -

অসিত কুমার রায়, বয়স - ৬২ বছর, অবসরপ্রাপ্ত, ঠিকানা - শিবালিক পার্ক, শিলচর, কাছাড়, আসাম।
হারু দাস (ওঝা), বয়স - ৫৫ বছর, ওঝানৃত্য শিল্পী, ঠিকানা - আনিপুর, করিমগঞ্জ, আসাম।
বিধান ভট্টাচার্য, বয়স - ৬০ বছর, মনসা পূজার পুরোহিত, ঠিকানা - ফুলেরতল, কাছাড়, আসাম।
কালীকিশোর নমঃসূত্র, বয়স - ৫০ বছর, ওঝানৃত্য শিল্পী, ঠিকানা - দিলখুশবন্তী, কাছাড়, আসাম।